১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার কার্যকরণ।

খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম *

সারসংক্ষেপ ঃ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে লিখিল ভারত মুসলিম লীগ কেন জনপ্রিয় হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ এর নির্বাচনে মুসলিম ভোটের মাত্র ৪.৪% ভোট পেল। এই দলই ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে মুসলিম ভোটের ৭৫% ভোট পেল কিভাবে? উল্লিখিত কালপর্বে মুসলিম লীগ কেন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল? এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে জানা যায়, ১৯৩৭ এর নির্বাচন এবং ১৯৩৭-৩৯ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা মুসলিম মানসে এই অনুভূতির জন্ম দেয়, স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সংখ্যালঘুর মর্যাদার বেশী কিছু দিবে না। তাই মুসলমানরা চিন্তা করল-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের যে শাসনব্যবস্থা সেটাতে শুধুই 'হিন্দু কংগ্রেস' ভাবিকালের ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তাই অন্য পন্থা খুঁজতে হবে।

সূচক শব্দ ঃ কংগ্রেস, বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি, ভারত শাসন আইন।

১

লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে (১৮৮৪-৮৮), ১৮৮৫ তে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানে ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র দু'জন ছিলেন মুসলিম। ১৮৮৭ সাল নাগাদ লক্ষ্য করা গেল প্রায় বছরই কংগ্রেসে মুসলিম অংশগ্রহণ বেড়ে চলেছে।[১] সৈয়দ আহমদ খান 'কংগ্রেসকে সমর্থন করলে মুসলিমরা বিপর্যয় ডেকে আনবে' মর্মে সতর্ক করেন। মুসলিমদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৯৩ সালে সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠা করেন 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন', যা তেমন প্রভাব বিস্তারকারি সংগঠনরূপে গড়ে উঠতে পারেনি।

অংশীদারিত্বের দাবী নিয়ে ১৯০৬ সালে সিমলা ডেলিগেশন পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ডিসেম্বর ১৯০৬ এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো।[২] সিমলা ডেলিগেশন এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৯ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন-এ দুটো আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি হল, যা মুসলিমদের একটি পৃথক সাংবিধানিক অস্তিত্ব দিল।

মর্লে মিন্টো সংস্কার পরবর্তীতে ১৯১০-এ যে নির্বাচন হলো, সেখানে মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারলো না। এর ফল হলো ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো, তখন মুসলিম লীগকে আলোচনার জন্য কোন পক্ষ মনে করা হলো না। ভারতীয়

---

* সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলমানদের জন্য পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ রদ টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের বৃটিশদের প্রতি 'সহযোগিতার মনোভাব' এর স্থলে হিন্দুদের প্রতি 'আবেগী সহযোগিতা' স্থান পায়।[৩] ১৯১৩ সালে লীগ যে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। একই সময়ে ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের 'সাম্রাজ্যে ভারতের জন্য স্বশাসন' নীতি গ্রহণ করে।[৪] জিন্নাহর চেষ্টায় ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে লীগ এবং কংগ্রেসের অধিবেশন একই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমেই লীগের উদারপন্থী অংশ শক্তিশালী হচ্ছে এটা তারই প্রমাণ। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর ১৯১৬ তে লখনৌ চুক্তি[৫] স্বাক্ষরিত হয় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে, জিন্নাহ আবির্ভূত হন 'হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত' হিসেবে। ১৯২০ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ফিরলেন কংগ্রেসের যে অধিবেশনে তার সভাপতিত্ব করলেন জিন্নাহ। এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসে অস্থির কুঁড়ির দশক।

১৯১৯ সালের কাউন্সিল সংস্কারের পদক্ষেপ হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে বাড়িয়ে দিলেও অসহযোগ আন্দোলন বিভাজনগুলোকে সাময়িক আড়াল করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী সময়ে উক্ত বিভাজন প্রকাশ্যে চলে আসে। খিলাফত আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে একটু প্রলেপ দিলেও খুব শিঘ্রই দু'সম্প্রদায়ই বিপরীতমুখী ধারায় চালিত হতে থাকে। ১৯২১ সালের 'মোপলা বিদ্রোহ'[৬] এবং ১৯২২ সালের 'মুলতান দাঙ্গা' সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে হিন্দু সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। গোটা বিশের দশকের মাঝামাঝিতে এসে কংগ্রেস এবং লীগের উদ্দেশ্য পাল্টে গেল- আগে ছিল বৃটিশ 'সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বশাসনে'র দাবি, এখন বলা হলো 'পূর্ণ স্বরাজ' এবং বৃটিশদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। তা ছাড়া লীগের উদ্দেশ্য তালিকায় 'সাংবিধানিক উপায়ে' কথাগুলি বদলে লেখা হল 'শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়'।[৭] পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী জিন্নাহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বদলাতে থাকলেন। ১৯২৭ সালে তিনি চারটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ১৯২৮ সালে ছয়, আর ১৯২৯ সালে বিখ্যাত চৌদ্দ দফা।[৮] ১৯২৭ এ কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গান্ধী নেহেরু প্রথম প্রকাশ্য সংঘাত বাধল- গান্ধী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এর পক্ষে আর নেহেরু চান 'পূর্ণ স্বরাজ'। ১৯২৯-এ জওহরলাল নেহেরু হলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৩০ এ প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সমঝোতায় আসতে পারলো না। ১৯৩১ এর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও সমঝোতায় আসতে না পারার প্রেক্ষাপটেই এলো ১৯৩২ এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ।[৯] সম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মুসলিমদের জন্য পাঞ্জাব এবং বাংলায় শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করে। উক্ত প্রদেশ দু'টোতে তারা শুধুমাত্র- স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী পেল না, তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে প্রাদেশিক পরিষদে বেশি আসন পেল। এখন বাংলা এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং নবসৃষ্ট সিন্ধ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণর এর স্ট্যাটাস মুসলমানদের জন্য প্রীতিকর সম্ভাবনা নিয়ে এল। কিন্তু যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেসব

প্রদেশের জন্য বিষয়টি প্রীতিকর ছিল না।[১০] এটা পরবর্তীতে সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন এবং সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হলো। এই আইনের অধীনে হলো ১৯৩৭ এর নির্বাচন। পাস হওয়া নতুন সংবিধানে জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' প্রস্তাব কার্যত প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানে যেসব রক্ষাকবচ রাখা হয়েছিল সেগুলো থেকে যে সুবিধা পাবেন বলে আশা করেছিলেন, তা তিনি পেলেন না। মুসলমান প্রধান প্রদেশ গুলোতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রত্যাশিত ফলাফল লাভে ব্যর্থ হল। সিন্ধু প্রদেশের আইন সভায় লীগ পেল তিনটি আসন, পাঞ্জাবে মাত্র একটি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটিও না, বাংলায় মুসলিম আসনের এক তৃতীয়াংশ। জিন্নাহর প্রত্যাশা ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে তৈরি একটি স্বতন্ত্র মঞ্চে মুসলিমদের সমবেত করে তিনি এমনভাবে 'প্রদেশের সীমানাগুলি নতুন করে টানবেন' যাতে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন এবং অন্যত্রও তাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব পান।[১১] মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে কার্যত প্রত্যাখ্যাত হয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করে দাবী আদায়ের অন্য কোন পন্থা মুসলিম লীগের সামনে অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু অচিরেই মুসলিম লীগ ঘুরে দাড়ালো, কিভাবে? এপ্রিল ১৯৩৮-এ জিন্নাহ দাবি করলেন 'বিগত ছয় মাসে লিগে নতুন এক লক্ষ সদস্য যোগ দিয়েছেন।' পরবর্তী এক দশকে এটাকে সূচনা বিন্দু বলা চলে। যে দল ১৯৩৭ এর নির্বাচনে ৪.৪% ভোট পেয়েছিল সেই দল ১৯৪৫-৪৬ এর নির্বাচনে ৭৫% ভোট পেল কিভাবে? এক দশকেরও কম সময়ে মুসলিম লীগের এ বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কি? বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কেন জনপ্রিয় হয়েছিল ? বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে মূলত চার ধরনের অনুকল্প দিয়ে- প্রথমতঃ মুসলিম লীগ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? প্রথম দু'দশক কিভাবে কাজ করত? ত্রিশের দশকের শেষ দিকে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো? কিভাবে কোন পন্থায় জনপ্রিয়তা পেল? ১৯৩৭ এর নির্বাচন পরবর্তী দশকের রাজনীতির গতিপথ কিভাবে পরিবর্তন করেছিল? দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কার্যাবলী ও প্রকৃতি কিভাবে ভূমিকা রাখে ? ১৯৩৭-৪৭ কংগ্রেসের কার্যাবলী মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তার পালে কিভাবে হাওয়া জুগিয়েছিল ? তৃতীয়তঃ ভারতীয়দের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব কতটুকু ছিল ? ১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে ঔপনিবেশিকতা কিভাবে ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল? চতুর্থতঃ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাজনৈতিক ক্যারিশমা কিভাবে মুসলিম লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে যতটা না, তার চাইতে বেশি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে ভারত ভাগে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন? হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দুত কিভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকলেন?

২

আগা খানের নেতৃত্বে ৭০ জন অভিজাত মুসলিমদের (বিভিন্ন রাজ্যের নামকরা ব্যক্তি, জমিদার, আইনজীবি, ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য) একটি দল ১লা অক্টোবর ১৯০৬ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলোতে মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী জানান। পরবর্তীতে ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে নওয়াব ভিখার উল মূলক, নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং মাজহারুল হক, মৌলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ এর উদ্যোগে লিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো। সংগঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয় প্রথমতঃ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের রাজনৈতিক সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা। তৃতীয়তঃ মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়া সৃষ্টি করা।[১২] ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই অভিজাত মুসলিমদের মিলন মেলা ছিল। লীগের বার্ষিক অধিবেশন হত শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অথবা ঘর ভাড়া করে। সেখানে বাইরের লোক বলতে থাকতেন বড়জোর কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথিগণ। আন্দোলনের কথা লীগ নেতারা ভাবতেও পারতেন না। খিলাফত আন্দোলনের যুগে মুসলিম লীগের প্রায় কোন অস্তিত্ব ছিল না। যখন খিলাফত সম্মেলন বা কংগ্রেসের অধিবেশন বসত তখন তার পাশাপাশি লীগের সভাও সেরে নেওয়া হত। বাকি সময়টা তার প্রায় কোন কাজকর্ম থাকত না।[১৩] অধিবেশন শেষ হওয়ার অর্থ ছিল যে সে বছরের মতো সংগঠনের কাজকর্ম শেষ। কেউই নজর দিত না কী বলা হয়েছে তা নিয়ে, কেবল অল্প কয়েক জনেরই মাসখানেক পরও মনে থাকত কী সব কথাবার্তা হয়েছিল। কেবল এই সব কথাবার্তার বিস্তারিত বিবরণ থাকত ভারত সরকারের নথিপত্রে।[১৪]

প্রথম দশকে লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ১৯২০ এর দশকের গোড়ায় ১২০০ ছাড়ায়নি। ১৯২৭ সালে সদস্য সংখ্যা ১৩৩০।[১৫] ১৯৩০ এর এলাহাবাদ সেশনে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল তাঁর যে ঐতিহাসিক ভাষণে ভারতের উত্তর পশ্চিমে যে মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী জানান সেখানে ৭৫ সদস্যের কোরামও পূরণ হয়নি। ১৯৩১ সালের দিল্লী অধিবেশনে বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ০৬ রুপির পরিবর্তে ০১ রুপি করা হয় এবং নতুন সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ০৫ রুপির বিধান বিলুপ্ত করা হয় নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্য, বার্ষিক অধিবেশনে কোরাম ৭৫ সদস্যের স্থলে ৫০ সদস্য করা হয়- যা লীগের ক্রমাবনতির প্রমাণ দেয়।[১৬]

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ৩০ এর দশকেও ভারতের মুসলমানরা ছিল বিভক্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং সাংগঠনিকভাবে দূর্বল।[১৭] মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র নয়। তখনও মুসলিম লীগ 'নবাব' ও 'জমিদার' দের দল। ভারতের মুসলমানরা কেমন বিভক্ত তার চিত্র নিম্নরূপ:

সারণী-১

প্রাদেশিক পর্যায়ে মুসলিম রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব[১৮]

ক্রমিক	প্রদেশ	নেতৃত্ব	দল
০১	উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারত	আল্লামা মাশরেকী	খাকসার মুভমেন্ট
০২	পাঞ্জাব	পুরাতন কংগ্রেসী	আহরাব পার্টি
০৩	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	খান আব্দুল গাফ্ফার খান	খুদা-ই-খিদমতগার
০৪	পাঞ্জাব	স্যার ফজল-ই-হোসাইন	ইউনিয়নিস্ট পার্টি
০৫	বাংলা	ফজলুল হক	কৃষক প্রজা পার্টি

উপরিউক্ত সারণিতে এটা স্পষ্ট, মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তৃত্ব ও প্রভাব মুসলিম লীগের মুসলিম প্রতিনিধিত্বে'র দাবির যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে যথেষ্ট সক্ষম ছিল। ১৯৩৭ এর নির্বাচন এর প্রমাণ দিল। ১৯৩৭- এর নির্বাচন কংগ্রেসের ফল হলো খুবই ভালো। প্রাদেশিক আইন সভার ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে তারা জিতল ৭১১টি। আর ১১টির মধ্যে ০৫টি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ) পেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আর বোম্বাইতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি (১৭৫ এর মধ্যে ৮৬টি), মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে অবশ্য ফল হলো খারাপ (৪৮২টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মাত্র ৮৫টিতে লড়াই করে জিতল মাত্র ২৬টি টিতে)। মুসলিম লীগ যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করত-স্পষ্টতই সেটা প্রমাণ করতে পারল না।[১৯]

মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ৪৮২ আসনের মধ্যে মাত্র ১০৯ আসনে বিজয়ী হলো। মুসলমান ভোটের মাত্র ৪.৮% পেল।[২০] মুসলিম প্রধান ০৪টি প্রদেশের (পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বাংলা) কোনটিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। এমনকি মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর চাইতে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে বেশি ভাল করল।[২১] নিম্নোক্ত সারণি থেকে নির্বাচনে মুসলিম লীগের সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি-০২
প্রাদেশিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন ও শতকরা হার[২২]

প্রদেশ	মোট মুসলিম আসন	মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন	শতকরা হার
মাদ্রাজ	২৮	১১	৩৯
বোম্বে	৩৯	২০	৫১
বাংলা	১১৯	৩৭	৩১
যুক্তপ্রদেশ	৬৪	২৭	৪৩
পাঞ্জাব	৮৬	০১	১.১
আসাম	৩৪	০৯	২৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৬	০	০
উড়িষ্যা	০৪	০	০
সিন্ধু	৩৬	০	০

প্রদেশ	মোট মুসলিম আসন	মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন	শতকরা হার
বিহার	৩৯	০	০
মধ্যপ্রদেশ	১৪	০	০

*মুসলিম ভোট ছিল মোট ৭৩,১৯,৪৪৫ এর মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৩২১, ৭৭২ ভোট যা মোট ভোটের মাত্র ৪.৪%।

উপরিউক্ত সারণিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মুসলিম লীগ ০৫টি প্রদেশে (উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ওড়িষ্যা, সিন্ধু, বিহার ও মধ্য প্রদেশে) কোন আসন পায় নি। পাঞ্জাব প্রদেশে পেল মাত্র একটি আসন। ভোটের হিসেবে সর্বোচ্চ ভোট পেল বোম্বেতে ৫১% সর্বনিম্ন ১.১% পাঞ্জাবে এবং সর্বোচ্চ আসন পেল বাংলায় ৩৭টি যা মোট আসনের ৩১.০৯%। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে স্পষ্টতই জিন্নাহর 'মুসলিম সংহতির আবেদন' মুসলিম ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখাত হল। কিন্তু জিন্নাহ একজন যোদ্ধা এবং দীর্ঘ সময়ের ধীরগতির খেলার একজন ওস্তাদ। চরমতম অসুবিধার মধ্যেও সুযোগ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে দক্ষ'।[২৩] অচিরেই জিন্নাহর সামনে সুযোগ এলো, কংগ্রেসই এ ব্যাপারে ব্যাপক রসদের যোগান দেয়। কংগ্রেস কিভাবে রসদের যোগান দেয়, সেটা একটু পরে দেখানো হবে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর জন্য কি বার্তা নিয়ে এলো? প্রথমতঃ প্রাদেশিক পর্যায়ে এটা অনুভুত হলো কেন্দ্রে তাদের একজন মুখপাত্র প্রয়োজন। জিন্নাহ এবং লীগই এই ভূমিকার জন্য উপযুক্ত।[২৪] দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৭ এর নির্বাচন মুসলমান নেতাদের স্বপক্ষে এক জোরদার হিন্দু প্রবল কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখতে পাচ্ছেন, যাকে মানা যায় না।[২৫] তৃতীয়তঃ মুসলমানরা বুঝলেন স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, ক্ষমতার ভাগ পেতে চাইলে অন্য উপায় খুঁজতে হবে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভোটের রাজনীতিতে তাদের সংখ্যালঘু হিসেবে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সমতা আনার জন্য স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চতুর্থতঃ যুক্ত প্রদেশের অভিজ্ঞতা দিয়ে মুসলিম লীগ বুঝলো কংগেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। ক্ষমতার ভাগ দিতে পারে বৃটিশরাই। কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলে আগে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নেওয়া দরকার।[২৬]

১৯৩৭ এর নির্বাচন ও যুক্তপ্রদেশকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের সংগঠন ও কর্মসূচী রূপান্তরিত হল। যুক্ত প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুসলিম লীগ অনুভব করল সংগঠন হিসেবে দাড়াতে হলে 'হিন্দু কংগ্রেস' বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ১৯৩৭ এর অক্টোবরে মুসলিম লীগের লখনৌ অধিবেশনে জিন্নাহ সম্পূর্ণ 'হিন্দু রীতি' অনুসরণের জন্য কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করলেন। জিন্নাহ বলেন 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানের ন্যায়বিচার বা সমদৃষ্টি পাওয়ার কোনও আশাই নেই এবং তাদের (কংগ্রেস এবং লীগ) মধ্যে কোনও বোঝাপড়াই সম্ভব নয়'।[২৭]

লখনৌ অধিবেশনে পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াতখান, বাঙলার ফজলুল হক এবং আসামের স্যার মোহাম্মদ সাদউল্লাহ মুসলিম লিগে যোগ দিলে লীগ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সুসংহত করে। অধিবেশনের রেজ্যুলেশন এ মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ভারতের 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' এবং ফেডারেশন এর

আওতায় 'মুসলমান ও অন্যান্য' সংখ্যালঘুদের স্বার্থের সুরক্ষা 'পর্যাপ্ত ও কার্যকরভাবে' উল্লেখিত হয়।[২৮] কংগ্রেস সরকারের হিন্দু উগ্রজাতীয়তাবাদী চর্চা মুসলমানদের ক্ষুদ্ধ করেছিলো নিঃসন্দেহে। 'বন্দে মাতরম ও ত্রিরঙ্গা পতাকার ব্যাপক ব্যবহার মুসলমানদের একই সংগে ক্ষুব্ধ করে এবং কংগ্রেস থেকে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'পীরপুর প্রতিবেদন' ও 'বিহার শরিফ প্রতিবেদন'।

সভায় দাঁড়িয়ে সরাসরি কংগ্রেসের মুণ্ডুপাত করা থেকে শুরু করে তুলনায় সংযত, কিছুটা তথ্যভিত্তিক প্রতিবাদ পিরপুর রিপোর্ট। রিপোর্টটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে লীগ কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে একটা বড় সাফল্য পেল।[২৯] লখনৌ অধিবেশন এর পরে অক্টোবর ১৯৩৭-এ যুক্তপ্রদেশে ৯০টির বেশি শাখা অফিস খোলা হয় এবং পাঞ্জাবে ৪০টি। যুক্তপ্রদেশে নতুন ১,০০,০০০ সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩০] জানুয়ারি ১৯৩৮ এ মুসলিমদের কংগ্রেসের পতাকাতলে আনার জন্য যে গণসংযোগ কর্মসূচী শুরু করে সেখানে মাত্র ৩.৩% মুসলিমকে কংগ্রেসে আনতে সক্ষম হয়।[৩১]

আসলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৩৯) শাসনকালে মুসলিম লীগ কিছু সুবিধা পেয়ে যায়- প্রথমতঃ এই সময়ে কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হল। যেহেতু কংগ্রেস ক্ষমতায় সেহেতু দাঙ্গার দায়ভার সিংহভাগ পড়লো কংগ্রেসের কাঁধে, যদিও দাঙ্গাতে কংগ্রেস একমাত্র পক্ষ নয়। দ্বিতীয়তঃ দাঙ্গাগুলি হয়েছিল মূলত গ্রামে ও ছোট শহরে। আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্তদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষিজীবি ও কারুজীবি এবং প্রধানত মুসলিম। দাঙ্গার সুযোগে লীগ সাধারণ মুসলমানের হয়ে কথা বলতে পারল।[৩২] তৃতীয়তঃ ১৯৩৭-৩৯ এ ৮টি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ৬০টি আর ৩টি অকংগ্রেসি প্রদেশে ২৫টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।[৩৩] এ রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নার পক্ষে ক্রমশ খারাপ হতে থাকা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া এবং মুসলিম সমাজের 'একমাত্র পরিত্রাতা' হয়ে উঠে একটা 'স্বতন্ত্র মুসলিম স্বভূমি'র আশা জাগিয়ে তোলা আরও সহজ হলো।

১৯৩৯ এর শেষ দিকে যখন ০৭টি মন্ত্রিসভা থেকে কংগ্রেস পদত্যাগের ঘোষণা দিল তখন জিন্নাহর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের সমর্থন। তিনি তাঁর সমর্থকদের ২২ শে ডিসেম্বর 'অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অন্যায় থেকে মুক্তি দিবস' পালনের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের জন্যও এটা আশ্চর্যের যে 'শুধু মুসলিমরা নয়, পার্সি, খ্রিস্টান, কংগ্রেস বিরোধী বিপুল সংখ্যক হিন্দু' উৎসবে যোগ দিল।[৩৪] ১৯৩৭-৩৯ কংগ্রেসের অপশাসনই কি মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করেছিল? সমস্যার একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭ এর নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানরা অনুভব করল-স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী, মিশ্র মন্ত্রিসভা, আসন সংরক্ষণ, সমতা কিছুই মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজকীয় মর্যাদার নিশ্চয়তা দেয় না। তাই যেমনটা খালিদ বিন সায়িদ মনে করেন 'লাহোর প্রস্তাব'ই সেই নিশ্চয়তা দেয়।[৩৫] আলোচনায় তর্কে বিতর্কে মুসলিম লীগের প্রায় সব কৌশলেরই প্রয়োগ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিমদের তাতিয়ে দিতে ১৯৪০ এ এসে এমন একটি উপাদান প্রয়োজন ছিল যেটাকে উদ্দেশ্য করে একটি সফল আন্দোলন গড়ে তোলা যায়- পরবর্তী বছরগুলোতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৩ মার্চ ১৯৪০ এ যে লাহোর প্রস্তাব পাস হলো সেটি পরের দিন সমস্ত সংবাদপত্র 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হয়ে গেল। সংবাদপত্রগুলি মুসলিম জনসাধারণকে একটি স্লোগান সরবরাহ করল। লাহোর প্রস্তাবটির যথার্থ ব্যাখ্যা জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলতে হলে মুসলিম লীগ নেতাদের বিস্তর পরিশ্রম করতে হত। 'পাকিস্তান প্রস্তাব' এর ধারণাটি সেই পরিশ্রম বহুলাংশে বাঁচিয়ে দিল।[৩৬]

মুসলিমদের মধ্যে 'লাহোর প্রস্তাব' কিভাবে প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে উঠল? খালিদ বিন সায়িদ চারটি কারণ নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমতঃ মুসলিমরা ভারতবর্ষ শাসন করেছেন, তারা বুঝতে পারে না গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা কেন ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত হবে। তারা যাদের শাসন করেছে, তাদের অধীনে তারা কেন শাসিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর কোন মাথা ব্যাথা ছিল না যতটা ছিল রাষ্ট্রে সরকারের অংশ হওয়া নিয়ে। জিন্নাহ এই শ্রেণীকে নতুন মুসলিম রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্ভাবনা দেখালেন। তৃতীয়তঃ মুসলিম লীগের দু' আনা সদস্যদের একটি বিরাট অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না। তারা গ্রামীণ দরিদ্র মুসলমান, মোল্লারা তাদের স্বপ্ন দেখাত আল্লাহ ক্ষমতা দেবেন তখন যখন তারা ভাল মুসলমান হবেন। যদিও মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণাটা নতুন নয়। কম অভিজাত এবং লীগ বিরোধী মুসলিম সংগঠন 'আহরার' এবং 'খাকসার' অনেক আগেই মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছে। আহরারদের মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা ছিল 'হুকুমাত-ই- ইলাহিয়া' এবং খাকসারদের মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা ছিল 'ইসতিখালাফ-ফি-আল-আর্দ'।[৩৭] চতুর্থতঃ মুসলিমদের মধ্যে যেমন বড় শিল্পগ্রুপ আদমজি এবং ইস্পাহানি, তেমনি হিন্দুদের মধ্যে ছিল ডালমিয়া এবং বিরলা এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। কারণ পাকিস্তান মুসলিম শিল্পপতি, ব্যাংকার এবং পুঁজিপতিদের সামনে কম প্রতিযোগিতা এবং বেশি মুনাফার সম্ভাবনা নিয়ে এলো।[৩৮]

সুতরাং যখন লীগ 'পাকিস্তান' দাবি করল তখন মুসলমানদের মনের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার আকাঙ্খা। মুসলিম লীগের সামনে তখন দু'টি শ্রেণি এর একটি উচ্চশিক্ষিত, যারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পেতে আগ্রহী শ্রেণি, যারা হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে মুক্তভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে আগ্রহী ছিল। অন্য দিকে সাধারণ মুসলমান যারা অস্পষ্ট এক ধর্মীয় আবেগ দ্বারা পরিচালিত ছিল।

কংগ্রেসের শাসনকাল (১৯৩৭-৩৯) এর নানাবিধ অসংগতির মধ্যে মুসলিম লীগ নিজস্ব পন্থায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। এর পর লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে গোটা চল্লিশের দশকের মুসলিম রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১ জানুয়ারি ১৯৩৮ এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ এ ৫৬টি মুসলিম আসনের উপনির্বাচনে লীগ জিতলো ৪৬টি, স্বতন্ত্র মুসলিম ০৭টি এবং কংগ্রেস ০৩টি।[৩৯] ১৯৪২ সালেই মুসলিম লীগ জনগণের পার্টি হলো এবং জিন্নাহ হলেন জননেতা।[৪০]

মুসলিম লীগ অনেকটা নির্ভর করত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পরিচালিত প্রচারণার উপর। এই ছাত্ররা প্রায়ই প্রত্যন্ত গ্রামে লীগ সদস্যদের সঙ্গে প্রোপাগান্ডায় অংশ

নিত। পরবর্তীতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে তৈরি হলে তারা পাঞ্জাবে অত্যন্ত সক্রিয় হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালিন বন্ধে মুসলিম ছাত্ররা পাঞ্জাবে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালাত এবং তারা মুসলিম লীগের সমর্থন বাড়াতে সক্ষম হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাদের সমর্থন ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। একটি সূত্র মতে, এক হাজারের উপর ছাত্রদের নির্বাচনী কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে আলীগড় থেকে সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে পাঠানো হয়। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারণায় ক্রমাগত ও সার্বক্ষনিক যোগাযোগ হতো।[৪১]

এছাড়াও মুসলিম লীগ আদমজি ও ইস্পাহানিদের পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই শক্তিশালি প্রেস তৈরি করে বিশেষ ভাবে উর্দুতে। দিল্লীতে উর্দুতে ছিল *আনজাম, জং* এবং *মানসুর* এবং ইংরেজিতে ছিল *ডন*। লাহোরে উর্দুতে প্রকাশিত হত *ইনকিলাব, নওয়া-ই- ওয়াকত, পায়সা, আকবর* এবং *জমিনদার*। লখনৌতে *হামদাম*। কলকাতায় উর্দুতে *আমরে জাদিদ*, বাংলায় *আজাদ* এবং ইংরেজিতে *স্টার অব ইন্ডিয়া*। মুসলিম লীগের প্রচারণায় এসব পত্রিকাগুলো ব্যাপক অবদান রাখে। খালিদ বিন সায়িদ দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু পত্রপত্রিকা, উপন্যাস কিভাবে হিন্দুত্ববাদ কে উসকে দিয়েছে।[৪২] এরই সমান প্রতিক্রিয়া হিসেবে *ডন* এবং *মানছুর* এ ৩২টি প্রবন্ধ ছাপানো হয় 'এটা আর কখনই ঘটবে না' শিরোনামে তারা বিবরণ দেয় কংগ্রেসের আড়াই বছরের শাসনামলে কিভাবে মুসলমানদের গরু খাওয়া নিষিদ্ধ হয়, কিভাবে মসজিদের নামাজ-এ বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, দাঙ্গা কিভাবে তাদের জীবন ও সম্পদের উপর আঘাত করে।[৪৩]

কংগ্রেসের আড়াই বছরের শাসনামলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক এজেন্ডাকে পুঁজি করে (যতই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হোক) মুসলিম লীগ ১৯৩৭-৪৭ কালপর্বে কংগ্রেস ও বৃটিশের অন্য একটি পক্ষ হয়ে উঠেছিল। মুসিলম লীগ এক্ষেত্রে 'ইসলাম' কে অবলম্বন করে হিন্দু কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে জমিদার, ব্যবসায়ি, আইনজীবী, মোল্লা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রজাদের প্লাটফর্ম হিসেবে সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। তাই ১৯৪৫-৪৬ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। মুসলিম লীগ মুসলিম ভোটের প্রায় ৭৫% অর্জন করে। তারা কেন্দ্র প্রদেশিক পরিষদে ৫৩৩টি আসনের মধ্যে ৪৬০টি আসনে বিজয়ী হয়।[৪৪] যেগুলো বলা হলো এর সঙ্গে আরও কিছু অনুঘটক আছে, প্রথমেই 'কংগ্রেস'। কংগ্রেস বরাবরই দাবী করে এসেছে কংগ্রেস 'হিন্দু' 'মুসলিম'সহ সব ধর্মমতের প্রতিনিধিত্বকারি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দল। তাহলে মুসলিম লীগের উত্থান হলো কেন ?

৩

১৯৩৭ এ লীগের বিরাট পুনরুত্থান হয় যুক্ত প্রদেশকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস লীগের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনে গররাজি হয়েছিল। নির্বাচনের পরে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে খালিকুজ্জামান এর যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়ার প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস। কিন্তু আরও গুরুতর কারণ হলো জুলাই ১৯৩৭ এ কংগ্রেস জিদ ধরে যে মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেতে হবে।[৪৫] সুমিত সরকার যুক্তি দেখিয়েছেন যে, লীগের সর্বভারতীয় নির্বাচনী ইশতেহারে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের লক্ষ্যমুখী

যেকোন আন্দোলনের নিন্দা করা হয়।' সুতরাং লীগের এ ধরনের কর্মসূচী কংগ্রেসকে উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। অন্তত: দু'টো উদাহরণ সুমিত সরকারের যুক্তির অসারতার প্রমাণ দেয়- প্রথমতঃ সুমিত সরকারই জানাচ্ছেন 'বিহারে স্থানিয় জমিদারদের চাপে পড়ে কিসান সভার বহু জঙ্গী কর্মীকে মনোনয়ন দেওয়া হলো না, আর কংগ্রেস নেতা এএন সিংহ স্বীকারই করলেন যে, তাঁর দলের বেশিরভাগ প্রার্থী এসেছেন জমিনদার শ্রেণি থেকে।[৪৬] দ্বিতীয়তঃ সুমিত সরকারই অন্যত্র জানাচ্ছেন- 'বাংলার কংগ্রেস নেতারা অবশ্য বাক্যচ্ছটা বিস্তারের জন্য ভূমি সংস্কারের কথা বড় একটা বলতেন না। তার কারণ মনে হয় এখানকার জমিনদারদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু'।[৪৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলেই জমিনদার প্রভাব ক্রিয়াশিল তাই যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস এবং লীগ নির্বাচন পরবর্তীতে সমঝোতায় আসতে পারল না এ ব্যর্থতার দায় বিজয়ী কংগ্রেসকেই নিতে হচ্ছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষ্যে এর সমর্থন মেলে '...জওহরলাল এর কার্যক্রম যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগকে নতুন জীবন দিল। ভারতীয় রাজনীতির ছাত্র মাত্রই জানেন যুক্তপ্রদেশ থেকেই মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়েছিল। মি. জিন্নাহ পরিস্থিতি পুরো সুবিধা নেন এক সর্বাত্মক আক্রমণাত্মক অবস্থান নেন সেটা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান তৈরী করে'।[৪৮] কংগ্রেস মুসলিম লীগকে জোটে নিলে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু সে কথা তো কংগ্রেস আগেই কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিল। কারণ যুক্তপ্রদেশে মাত্র ০৯ আসনে বাংলায় একটিও আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি।[৪৯] তাহলে কংগ্রেস লীগের সঙ্গে জোট গড়ল না কেন ? কারণ কংগ্রেস নিজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছিলেন। এতটা সাফল্য পাবে, সেই নিশ্চয়তা ছিল না বলেই কংগ্রেস নির্বাচনী আঁতাতে গিয়েছিল; এখন সহযোগীকে ক্ষমতার মর্যাদা দিয়ে নির্বাচনী আঁতাতে গিয়েছিল; এখন আর সেই আঁতাতকে মর্যাদা দিয়ে 'সংখ্যা ছোট, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক' সহযোগিকে ক্ষমতার ভাগ দেওয়ার দরকার থাকলো না। এটা একে বারে বিশুদ্ধ সংখ্যাগুরুবাদ এর বাস্তব পরিণাম ভয়ঙ্কর।[৫০]

১৯৩৭ সালে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম আমলে প্রার্থী দিয়ে বরং সেগুলিতেও হেরে গিয়েও কংগ্রেস নিজেকে একটি জাতীয় দল হিসেবে গণ্য করেছিল। ফৈজপুর কংগ্রেসে নেহেরুর বিখ্যাত উক্তি 'ভারতবর্ষে দু'টি শক্তি আছে–'জাতীয়তাবাদের প্রতীক কংগ্রেস এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বৃটিশ' জিন্নাহ বলেছিলেন 'তৃতীয় আরেকটি শক্তি আছে– মুসলিম'।[৫১] তিনি আরও যুক্ত করেন– 'আমরা কারও দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিনা। আমরা প্রগতিশীল ও স্বাধীন চরিত্রের যে কোন গ্রুপকে কর্মসূচী ও নীতির ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমরা কোন দলের অন্ধ অনুসারি হব না। আমরা ভারতের কল্যাণের জন্য সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত'।[৫২] কংগ্রেস এবং নেহেরু মুসলিম লীগকে সমান অংশীদার হিসেবে স্বীকার তো করেইনি বরং অবজ্ঞা করেছিল ।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর দু'টো বিষয় সামগ্রিক ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারি প্রভাব ফেলেছিল– প্রথমতঃ কংগ্রেস যখন সরকার গঠন করল, অকংগ্রেসি মুসলমানরা হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে, কংগ্রেস যদি একটাও মুসলিম আসন না পেয়ে নিছক সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটের জোরে আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাহলেই তারা সরকার গড়তে পারে। মুসলিম রাজনীতিকরা স্বতন্ত্র

রাজনৈতিক স্বত্বা বিসর্জন না দিলে সরকারের বাইরেই থেকে যাবেন। আবার নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিলে তারা নির্বাচিতই হবেন না। [৫৩] দ্বিতীয়তঃ নতুন আইনসভা শুরু হলো 'বন্দে মাতরম' এর সুরে।[৫৪] সরকারি ভবনগুলোতে উড়তে লাগল ত্রিরঙ্গা পতাকা গোটা আবহই জানান দিচ্ছিল 'হিন্দু রাজ' এসে গেছে। 'হিন্দু রাজ' ব্যাপারে খালিদ বিন সায়িদ গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন– প্রথমতঃ মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, তিনি প্রথম রাজনীতিতে 'হিন্দু পন্থা'র অনুপ্রবেশ ঘটান। জওহরলাল নেহেরু গান্ধীর যত্রতন্ত্র 'রাম রাজ' এর ব্যবহার নিয়ে বিব্রত ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শাসনামলে শিক্ষা প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'বিদ্যা মন্দির'। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এর প্রতিবাদ করা হলেও এটি আমলে নেওয়া হয়নি। [৫৫]

হিন্দু মহাসভার প্রভাব ক্রমেই কংগ্রেসের উপর বেড়ে চলছিল। 'হিন্দু মহাসভার সদস্য হলে কংগ্রেসের সদস্য থাকা যাবে না।' কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি এই ঘোষণা করতে ১৯৩৮ এর ডিসেম্বর লেগে গেল। এ বছরগুলোতে হিন্দু মহাসভার শক্তি বাড়ছিল। ডিভি সাভারকার ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ নাগপুর অধিবেশনের ঘোষণা করেন, 'আমরা হিন্দুরাই একটা জাতি ... হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের যদি কেউ বলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক তাতে (তাদের) সংকোচ বোধ করার আদৌ কিছু নেই। [৫৬]

১৯৩১ এ জন্ম নেওয়া আর এসএম (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ) এর গোলবলকর যখন নেতা হন ১৯৪০ এ তখন ঐ সংগঠনে ছিল ১,০০,০০০ শিক্ষাপ্রাপ্ত তথা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল কর্মী, যারা আপোষহীন সাম্প্রদায়িকতার ভাবাদর্শের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।[৫৭] হিন্দু ব্যবসাদারদের বেশিরভাগই ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া এবং প্রায়ই পুনরুত্থানবাদী, গোরক্ষবাদী ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত। [৫৮]

জওহরলাল নেহেরু ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯ এ স্বীকার করেন, সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের বৃদ্ধি তারা রোধ করতে পারেননি। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানকার মুসলমান কৃষকদের মধ্যে খান সাহেবের মন্ত্রিসভা সমর্থন হারাতে শুরু করে, কারণ হিন্দু ও শিখ ব্যবসাদার ও মহাজনদের বিরোধিতার মুখে পড়ে, গ্রামীণ ঋণভার কমানোর জন্য তারা ব্যবস্থা করতে পারেনি।[৫৯]

এর পূর্বে আমরা দেখিয়েছি কংগ্রেস গৃহিত মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচীর ব্যর্থতা, যে কর্মসূচী মাত্র ৩.৩% মুসলমানকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল অতএব, এখন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করছি কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতা অনেকটা কাগুজে বক্তব্য হয়ে গেল। মুসলিম গণসংযোগ কর্মসূচীর ব্যর্থতা আর কংগ্রেসে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলা হিন্দু মহাসভার প্রভাব, আর অবশ্যই জওহরলাল এর মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার না করার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দু'মেরুতে চলল। ১৯৪০ এর প্রথমেই কংগ্রেসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম লীগের সরব উপস্থিতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের গতিপ্রকৃতি বদলে দিয়েছিল। বৃটিশ বিরোধী স্বাধিনতা আন্দোলন এখন হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হল। সাম্রাজ্য এখন আর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থাকলনা। মুসলিম লীগের এ উত্থানে কি দায় শুধু কংগ্রেসেরই ছিল? অবশ্যই আরও একটি উপাদান 'বৃটিশ নীতি' এতে ব্যাপক রসদের যোগান দেয়।

৪

১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বোঝাপড়ার প্রত্যশা পরিত্যাগ করে বৃটিশের মুখাপেক্ষী হয় এই কারণে যে ক্ষমতার ভাগ দিতে পারে বৃটিশরাই। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশদের প্রয়োজন ছিল ভারতের সমর্থনের। কিন্তু **১৯৩৯** এর সেপ্টেম্বর লর্ড লিনলিথগো ভারতকে যুদ্ধের শরিক এবং সহযোগী দেশ হিসেবে ঘোষণা করলে ব্যাপক প্রতিবাদ শোনা গেল-বিশেষত কংগ্রেসের তরফে। এ রকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে বৃটিশের প্রয়োজন ছিল আরো একটি পক্ষের, সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ বৃটিশের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল।

১৯৩৯ এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর জিন্নাহ বড়লাটকে তাঁর হাত শক্তিশালী করার অনুরোধ জানান। জিন্নাহ অবিলম্বে কংগ্রেস মন্ত্রীদের বহিষ্কারের দাবী জানান আরও বলেন '... কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হলো। বৃটিশ এবং মুসলমান দু'পক্ষকেই ধ্বংস করা'।[৬০]

১৯৩৯ এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে প্রদেশ গুলোতে গভর্ণরের শাসন চালু করার ফলে যুদ্ধের কাজও অনেক সহজ হয়ে গেল। বৃটিশদের বিশ্বাস ছিল যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে না। যদি করে সেটা মোকাবেলা করার পন্থা সরকারের জানা আছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ **১৯৩৯** এর শেষেও সরকারের যুদ্ধ প্রয়াসে সমর্থনও করেনি বিরোধিতাও করেনি। এমতাবস্থায় যাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ প্রতিকুলতার সম্মুখীন না হতে হয় সেই উদ্দেশ্যে বড়লাট অন্যত্র সমর্থন খুঁজতে চাইলেন। সেই খোঁজে স্বভাবতই জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের দিকে নজর দিলেন।[৬১]

যুদ্ধকালিন সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুসলিম লীগের দাবিকে আরও বেশি করে ইন্ধন যোগানো। **১৭** অক্টোবর **১৯৩৯** এর বিবৃতিতে কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আর আগস্ট প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবেই বলা হয় যে, 'ভারতের জাতীয় জীবনের একটা বড় ও শক্তিশালী অংশ যাদের কর্তৃত্ব সরাসরি অস্বীকার করে তেমন কোন ধরণের সরকারের কাছেই বৃটিশরা দায়িত্ব হস্তান্তর করবে না।' যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই যা কিছু ছিল জিন্নাহর কেন্দ্রীয় দাবী, ফলত এতে তাই মেনে নেওয়া হলো: লীগ শুধু ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্রই নয়, ভবিষ্যৎতের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও লীগের এক ধরণের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।[৬২] যুদ্ধকালিন পরিস্থিতি বুঝতে জিন্নাহর সময় লাগলো না-'যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে... আমি গান্ধীর সমান গুরুত্ব পেলাম। আমাকে হঠাৎ যেভাবে গান্ধীর পাশে বসানো হল, সেটা দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলাম'।[৬৩] লীগকে সংহত করে তুলতে লিনলিথগো বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন, কারণ জিন্নাহ তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। জিন্নাহ যদি কংগ্রেসের দাবি সমর্থন করতেন তাহলে তাঁকে যৌথ দাবি দাওয়ার মোকাবেলা করতে হত, সেক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের সমস্যা বেড়ে যেত ।[৬৪] লাহোর প্রস্তাবের পূর্বে বৃটিশ ভূমিকা স্পষ্ট- ০৬ ফেব্রুয়ারি, **১৯৪০** এ জিন্নাহকে বড়লাট বলেন, 'যে দলের নীতি শুধুই নেতিবাচক তাদের জন্য বৃটিশের সহানুভুতির আশা করা বৃথা। যদি তিনি ও তাঁর বন্ধুরা চান যে

মুসলমানদের বিষয়টি যুক্তরাজ্যে হেলায় হারিয়ে যাবে না, তাহলে সত্যিই যা না হলেই নয় তা হলো অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা'।[৬৫]

কংগ্রেস ১৯৪২- এর জুলাইয়ে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাশ করার পর ৮ আগস্ট ১৯৪২ এ গান্ধী ঘোষণা করলেন মন্ত্র 'কর অথবা মর' 'আমরা ভারতকে মুক্ত করব অথবা এটা অর্জনের জন্য মরব।'[৬৬] লিনলিথগো দেরি করলেন না গান্ধী এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় পরবর্তী দিনের সূর্যোদয়ের পূর্বেই।[৬৭] ০৯ আগস্ট ১৯৪২-এ জিন্নাহ বললেন 'আমি গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি যে নানা ব্যক্তি, দল এবং সংগঠনের নানাবিধ সাবধান বাণী সত্ত্বেও কংগ্রেস একটি ব্যাপক গণ আন্দোলন ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়াও লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কে 'ভারতে হিন্দু কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাশ্য বিদ্রোহ' হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। আরও বলা হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন 'ভারতীয় মুসলমানদের জোর পূর্বক কংগ্রেসের শর্ত এবং কর্তৃত্বে আনার প্রয়াস।'[৬৮] সুতরাং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মুসলিম লীগ বৃটিশের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামল না।'ভারত ছাড়ো' থেকে দুরত্ব রেখে মুসলিম লীগের ব্যাপক সুবিধা হয়েছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ ২০,০০০ কর্মী কারাবরণ করেন।[৬৯] অপরদিকে মুসলিম নেতাদের জেলে যেতে হয়নি, উল্টো রাজনীতির মাঠে কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে ১৯৪২-৪৬ মুসলিম লীগের ব্যাপক উত্থান ঘটে। জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকটাই প্রতিরোধ হীন সুযোগ পেলেন।[৭০] যুদ্ধের শেষ দিকে বৃটিশদের সহযোগিতায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক বিকাশ হলো দ্রুতগতিতে-

> বাংলায় ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে ফজলুল হককে পদত্যাগে বাধ্য করানো হলো। শ্যামা-হক সরকারের জায়গায় নাজিম উদ্দীনের লীগ মন্ত্রিসভাকে বসানো হল। ফজলুল হক তার ০৮ সদস্যের মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়াতে চেয়েছিলেন। অথচ নাজিমউদ্দীনকে ১৩ সদস্যের মন্ত্রিসভা গড়তে অনুমতি দেওয়া হল। সিন্ধুতে আল্লা বক্স তাঁর খান বাহাদুর ওবিই খেতাব ফিরিয়ে দিলে ১৯৪২ সালে গভর্নর কর্তৃক বরখাস্ত হন। তাঁর পরিবর্তে আইন সভার লীগ নেতাকে সরকার গড়তে ডাকা হয়। আসামে নির্দলীয় সদস্য রোহিনী কুমারকে মন্ত্রিসভা গড়তে না দিয়ে গভর্নর মুসলিম লীগকেই সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানান।[৭১]

উপরোক্ত উদাহরণ গুলো এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ দেয় বৃটিশ নীতিকে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ গুলোতে মুসলিম লীগ একের পর এক প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তাই বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে যেখানে কোনও প্রদেশেই লীগ সরকারের অস্তিত্ব ছিলনা। অথচ ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে চারটি প্রদেশে (বাংলা, আসাম, সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) মুসলিম লীগ সরকার।

মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে যেমন প্রত্যক্ষ বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তেমনি কংগ্রেস ও সে জমিনটি তৈরী করে দিয়েছিল, সেটি আমরা পূর্বে দেখিয়েছি। কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন অমিমাংসিত রয়ে গেছে-মুসলিম লীগের বিপুল জনপ্রিয়তার পেছনে জিন্নাহর ভূমিকা কি ছিল? জিন্নাহ একটি নামমাত্র সংগঠনকে কিভাবে কোন পন্থায় সর্বভারতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করান ?

'... entire equipment was confined to an attache-case, a type writer, and a personal assistant'.[৭২]

উপরিউক্ত মন্তব্যটি করা হয় মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অবদানকে বোঝানোর জন্য যে, জিন্নাহ একাই পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আবার অনেকে এতদুর পর্যন্ত মন্তব্য করেন–'জিন্নাহ যদি আগেই (১৯৪৭) মারা যেতেন তাহলে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হত না।'[৭৩] তাই প্রায়ই বলা হয় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি ও সামর্থ্যের পুরোটাই জিন্নাহর ক্যারিশমা। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন ওঠে তাহলে ১৯১৯-১৯৩০ কালপর্বে জিন্নাহ যখন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন তখন কেন সংগঠনটি শক্তিশালী অবস্থায় গেল না? মুসলিম লীগকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে দাড়াতে কেন ১৯৪০ এর দশক লেগে গেল? কারণ আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে 'লাহোর প্রস্তাব'ই মুসলিম লীগকে উক্ত দশকে জনপ্রিয় করেছিল। এর সঙ্গে জিন্নার ক্যারিশমা যুক্ত হয়েছিল কিভাবে?

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলেই ক্যারিশম্যাটিক লিডারশিপ ছিল। কংগ্রেসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন 'মহাত্মা' যা হিন্দু মননের সহজাত হিসেবে প্রায় ঐশ্বরিক অনুভূতি দেয়। আবার অন্য দিকে মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন 'কায়েদে আযম' যা তার পশ্চিমা অভ্যাস এবং মেজাজকে ধারণ করত, কখনই ধর্মীয় নেতা বা পবিত্র মানুষ হিসেবে নয়। [৭৪]

জিন্নাহ এমন প্রজ্ঞাবান এবং বিচক্ষণভাবে উপস্থাপিত হতেন, যেন হিন্দুরা তাকে ভয় পায়। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জিন্নাহর অসাধারণ গুণাবলি ছিল। জিন্নাহ অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে বিতর্কিত বিষয়ে নিজেকে এবং লীগকে দুরে রাখতেন। যেমন তিনি নিজে ছিলেন শিয়া এবং খোঁজা, কিন্তু সুন্নী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের একজন হয়ে গণপ্রার্থনায় অংশ নিতেন।[৭৫] তিনি ছিলেন একজন সংবিধানবাদী মেধাবী এক ধনী আইনজীবি, যিনি সম্ভবত যে কারও চাইতে ভালো সংসদীয় সরকারের কলা কৌশলের উপর বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর সমগ্র মনন ছিল সাংবিধানিক ধ্যান ধারণায় আকীর্ণ।[৭৬] তাঁর জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংবিধান ছিল তাঁর কর্তৃত্বের মূল উৎস। ১৯৪৪ সালের সংবিধানে ৩৩ নং ধারায় '... The president shall be the Principal head of the whole organization shall exercise all the powers inheritant in his office and be responsible to see that all the authorities work in consonance with the constitution and Rules of the All India Muslim League'.[৭৭] উক্ত ধারাটি মুসলিম লীগের সভাপতির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদিতার স্বাক্ষ্য দেয়। বস্তুত জিন্নাহ লিগে একক ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদিতা কায়েম করেন। ১৯৩৯ এর মধ্যে জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখাগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সংগঠনের আধিপত্য এতটাই বাড়িয়ে তুললেন যে, এখন তাদের পক্ষে হাইকমান্ডের অনুমতিছাড়া কোন বোঝাপড়া সম্ভব ছিল না। আসলে কায়েদে আযম ছিলেন মুসলিম লীগের অপরিহার্য সম্পদ। চল্লিশের দশকের প্রায় সব গণ জমায়েতেই শেরওয়ানি পরে হাজির হতেন।[৭৮] তিনি ছিলেন দুর্বোধ্য ও নিরুত্তাপ এবং প্রায়ই সাধারণের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে দিতেন তিনি উদ্ধত ও স্বৈরাচারী। পশ্চিমা প্রশিক্ষণ ও মেজাজ দিয়ে তিনি তার লোকদের চিনতেন। তিনি জানতেন শেষ পর্যন্ত 'ইসলাম' সিংহভাগ মুসলমানের আনুগত্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে।[৭৯] পূর্বে আমরা দেখিয়েছি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ তাঁর কৌশল পাল্টেছেন। ১৯৩৭

সালের নির্বাচনের পর তার সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা থাকলো না। বিরোধী রাজনীতির খাতিরে হোক বা অস্তিত্বের হুমকিতে হোক, মুসলিম লীগের নতুন পথের ঠিকানা খোঁজার প্রয়োজনীয়তা শুরু হলো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মোটমুটিভাবে জিন্নাহর ১৪ দফা বাস্তবায়ন হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৭ এর নির্বাচন জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে নতুন পথের ঠিকানা খুঁজতে বাধ্য করল। পূর্বে যেমনটা আমরা দেখিয়েছি, হিন্দু মহাসভার প্রভাবে কংগ্রেস কিছুটা হলেও সাম্প্রদায়িক পথে হাটা শুরু করল, মুসলিম লীগও কংগ্রেস বিরোধীতায় মাঠে নেমে মুসলমানদের সামনে নতুন কর্মসূচি দিল, মূল ভাষ্যটা হলো 'মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি।' ১৫ অক্টোবর ১৯৩৭ এর লখনৌ সম্মেলনে জিন্নাহ নিজেকে আমুলে বদলে ফেললেন। কালো শেরওয়ানির সঙ্গে লম্বা কোট, মাথায় কমপ্যাক্ট টুপি, সেটা শিঘ্রই জিন্নাহ ক্যাপ হলো বদলে যাওয়া জিন্নাহর বাহ্যিক রূপ। শিঘ্রই জিন্নাহ ক্যাপ মুসলিম লীগ নেতাদের প্রতীক হলো।[৮০] ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রায় ৫০০০ মুসলমানের জমায়েত জিন্নাহ কংগ্রেসের 'হিন্দু নীতি'র সমালোচনা করেন। তিনি আরও বলেন '... মুসলমানরা তাদের (কংগ্রেস সরকার) কাছে ন্যায় বিচার পেতে পারে না'। তিনি মুসলিম জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন... আপনাদের নিজেদের হাতে জাদুকরী শক্তি আছে। '... যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আগে একশতবার চিন্তা করুন, কিন্তু যদি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তাহলে শেষ পর্যন্ত সেটাতে স্থির থাকুন'।[৮১] লখনৌ সম্মেলন, ১৯৩৭ থেকে লাহোর সম্মেলন ১৯৪০ পর্যন্ত জিন্নাহর উদ্দেশ্য হলো মুসলিম লীগের গণসম্পৃক্ততা বাড়ানো। উদ্দেশ্য কিছুটা সফলও হল, মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা কয়েক হাজার থেকে ০৫ লাখে উন্নিত হলো।[৮২]

যেমনটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ১৯৩৭ এর নির্বাচন শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দিতে পারেনি আবার অশিক্ষিত মুসলমানদের ন্যূনতম সুবিধাজনক বার্তা দিতে পারেনি, এ দু'শ্রেণীর জন্যই লাহোর প্রস্তাব ১৯৪০ যেটা পরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হয়ে সুখকর বার্তা নিয়ে এলো। জিন্নাহ এমন একটা কর্মসূচি হাতে পেলেন যা পরবর্তী দশকে গোটা ভারতীয় রাজনীতিকে আকীর্ণ করে। জিন্নাহ অত্যন্ত চতুরতার সাথে পাকিস্তান আন্দোলন সামনে এগিয়ে নেন। তিনি বলেন '... আমরা আমাদের মধ্যে ঝগড়া করার অনেক সময় পাব এবং বিভেদগুলো নিস্পত্তি করারও সময় পাব যখন ভূল এবং ক্ষতগুলোও শুকিয়ে যাবে। ঘরোয়া নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নেও সময় পাব কিন্তু আজ আমাদের চাই সরকার। এটা একটা জাতি, নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া ও সরকার ছাড়া।[৮৩]

আবার ধর্মীয় ভাবাবেগ কে পুঁজি করেন কৌশলে। পাঠানদের সমাবেশে বলেন, 'তোমরা কি পাকিস্তান চাও না চাও না? (আল্লাহু আকবার উচ্চারিত) ভালো কথা, যদি তোমরা পাকিস্তান চাও মুসলিম লীগ প্রার্থীকে ভোট দাও। যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন না হও তোমাদের অবস্থান শুদ্রদেরও নীচে নেমে যাবে এবং ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হবে। আমি কখনও মুসলমানদের হিন্দুদের দাস হতে দেব না। (আল্লাহু আকবর)'[৮৪]

উপরিউক্ত বক্তব্য দু'টি মুসলমানদের তাতিয়ে দেওয়ার কৌশল, বৃটিশদের সঙ্গে কিভাবে নিজ অবস্থান সংহত করলেন? জিন্নাহ যুদ্ধ কালিন সময়ে বুঝে গিয়েছিলেন কংগ্রেস-বৃটিশ দ্বন্দ্বে বৃটিশ পক্ষে থাকাই

যুক্তিযুক্ত। তিনি অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থান বদলে ফেললেন। কিন্তু বিনিময়ে অত্যধিক দাবি জানিয়ে তিনি বৃটিশদের বিরক্তি উৎপাদন করলেন না, আবার যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের নিঃশর্ত সমর্থনও জানালেন না। বৃটিশ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বৃটিশদের সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষেত্রে লীগকে কংগ্রেসের সমকক্ষ করলেন।[৮৫] অন্যদিকে কংগ্রেসের আচরণে দেখা গেল দূর দৃষ্টি, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান এবং নমনীয়তার অভাব, ফলে তারা নিজেদের পুরনো প্রধান্য ফিরে পেল না। সাম্রাজ্যবাদী আনুকুল্যের সূর্যালোকে লীগ তরতর করে বেড়ে উঠল।[৮৬]

দরকষাকষিতে জিন্নাহর সক্ষমতার নিদর্শন দেখা যায় ১৯৩৯-এ কংগ্রেস বৃটিশের যুদ্ধে সমর্থন জানানোর যে সব শর্ত আরোপ করেছিল, তিনি প্রকাশ্যে সেগুলির বিরোধিতা করতে পারলেন না, কারণ তা হলেই তাঁর তথা লীগের গায়ে দেশপ্রেমিক নয়, বৃটিশের সমর্থক হিসেবে ছাপ পড়ত। আবার লীগের জন্য কিছু সুবিধা আদায় না করে কংগ্রেসকে সমর্থন করলে কেবল বৃটিশ সরকারই ক্ষুন্ন হতনা, কংগ্রেসের শক্তি বাড়ত, লীগ দূর্বল হত।[৮৭] জিন্নাহ অন্তবর্তী সহযোগিতার জন্য পাঁচটি শর্ত দিলেন- প্রথমতঃ প্রদেশগুলিতে জোট মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক আইনসভার মুসলিম সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের আপত্তি থাকলে কোনও প্রস্তাব অনুমোদন করা চলবে না। তৃতীয়তঃ পাবলিক প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের পতাকা উড়ানো যাবেনা। চতুর্থতঃ 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বন্ধ করতে হবে। পঞ্চমতঃ কংগ্রেসকে মুসলিমদের মধ্যে গণসংযোগের কর্মসূচি পরিহার করতে হবে।[৮৮] শর্তগুলো কংগ্রেসের জন্য কঠিন ছিল। স্বাভাবিকভাবেই জিন্নাহ পুরো দায় কংগ্রেসের উপর চাপান।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমা সম্পর্কে লীগ নেতারা বিস্ময়কর রকম নিরব ছিলেন। কারণ তারা জানতেন 'একবার পাকিস্তানের সীমা নির্দেশ হয়ে গেলেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসাধারণের কাছে আর সেই প্রস্তাবের আকর্ষণ থাকবেনা। তাঁরা জেনে যাবেন, তাঁদের পিছনে ফেলে রেখেই তৈরি হচ্ছে ওই রাষ্ট্র'।[৮৯] পাকিস্তান নামক ধারণাটিকে আস্তে আস্তে উদ্দীপনার শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যাওয়া হয় এমনভাবে যেন সেটি অর্জিত হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই উদ্দীপনা বজায় রাখতেই পাকিস্তানের সীমা নির্দেশ করা হল না, তাকে রেখে দেওয়া হল প্রায় কাল্পনিক আদর্শের এক চিন্তা হিসেবে। আর জিন্নাহ ? এই কল্পনাকে গোটা জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটি উন্মাদনার জন্ম দেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দুত আবির্ভূত হন কায়েদে আযম রূপে, যার এক ঘোষণাতেই ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ এ ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে তে লাখ লাখ মানুষ সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় লিপ্ত হয়। যার প্রত্যক্ষ ফল দেশভাগ।

৬

প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই দশকে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ ১৯৩০ এর দশকেও নবাব ও জমিদারদের দল। ১৯৩৭ এর নির্বাচন জানান দিল, সর্বভারতীয় পর্যায়ে

মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের প্রায় কোনো যোগ্যতাই নেই মুসলিম লীগের। কারণ স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে জানা গেল মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ 'অগভীর মূল বিশিষ্ট।' মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে মুসলমান ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত মুসলিম লীগ মাত্র এক দশকে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল মুসলমানদের মধ্যে। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে যুক্তপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যানকে পুঁজি করে এবং ১৯৩৭-৩৯ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যক্রমকে 'হিন্দু' প্রতিপন্ন করে মুসলিম লীগ প্রথমবারের মতো গণরাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় লীগ ফুলেফেঁপে বেড়ে উঠতে থাকে। ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধ শুরুর সময় যেখানে কোন প্রদেশেই মুসলিম লীগ ক্ষমতায় ছিল না, সেখানে যুদ্ধ শেষে দেখা গেল চারটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা। ততোদিনে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগ বৃটিশের কাছে সমান গুরুত্ব পাচ্ছে এবং মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদাও পাচ্ছে। ১৯৪০ এর দশকে এসে জিন্নাহর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব মুসলমানদের মধ্যে বঞ্চিত সংখ্যালঘুর অনুভূতি দেয়। মুসলমানরা অনুভব করে 'হিন্দু রাম রাজ্যে' তাদের সংখ্যালঘু হয়েই থাকতে হবে। মুসলিমদের সংখ্যালঘু না থাকতে চাওয়ার মানসিকতাতেই পাকিস্তান সৃষ্টি। সংখ্যালঘু উদ্বিগ্নতাকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে এক সূত্রে গেঁথেছিলেন জিন্নাহ, যার অবিসম্বাদিত প্লাটফর্ম ছিল মুসলিম লীগ। চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে না উঠে বরং সংখ্যালঘু মুসলমানদের মুক্তির উপায়ের প্লাটফর্ম হয়। এই প্লাটফর্মটির জমিন এমন একজন ব্যক্তি তৈরি করেন যিনি উর্দু ভাষাটা ভালোজানতেন না, যাঁর দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের লেশ মাত্র ছিল না। মুসলিম মোল্লারা যাকে কাফির-ই-আযম[৯০] উপাধি দিয়ে ছিলেন, তিনিই হলেন মুসলমানদের স্বপ্নের পাকিস্তানের কায়েদে আযম।

সহায়কপঞ্জি

[১] ১৮৮৫ থেকে ১৮৯২ এর মধ্যে কংগ্রেসে মুসলমান প্রতিনিধির গড় হার ছিল মোট প্রতিনিধির ১৩.৫%, ১৮৯৩ এর মধ্যে তা নেমে দাড়ায় ৭.১%। লখনৌ অধিবেশনে (১৮৯৯) প্রচুর স্থানীয় মুসলমান যোগ দেওয়ায় পরেব সংখ্যাটি কৃত্রিমভাবে ফেঁপে উঠেছে-১৮৯৩-১৯০৫ পর্বের সবক'টি অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এমন মোট ৭৬১ জনের মধ্যে মুসলমান ৩১৩ জন। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য খুব একটা ভাবিত ছিলেন না, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মুসলমান সংগঠন তখনও দেখা যায়নি। দেখুন, সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৩।

[২] ১লা অক্টোবর ১৯০৬ এ নওয়াব মহসিন-উল মুলক এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মিন্টোর কাছে সিমলায় পৃথক নির্বাচকমন্ডলী এর দাবী জানান, উপরোক্ত প্রতিনিধি দল থেকেই নওয়াব ভিখারউল মূলক এবং ঢাকার নবাব মিলে নিখিলভারত মুসলিম লিগের সুচনা করেন ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬, দেখুন, A.B. Rajput, *Muslim League: Yesterday & Today*, Muhammad Ashraf, Lahore, 1948, PP. 18-19.

[৩] দেখুন, Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1948*, Oxford University press, London, 1968, P. 32.

[8] Ibid, P. 32

[৫] লখনৌ চুক্তির ধারাগুলোর বিবরণ, দেখুন, Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence*, Rupa Co, New Delhi, 2009, PP 534-536, আলোচনার জন্য দেখুন, Ibid, PP. 103-107 আরও আলোচনার জন্য দেখুন, Stanley Wolpert, *Jinnah of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 2004, PP. 42-60.

[৬] বিস্তারিত দেখুন, Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1948*, PP. 54-56

[৭] Jaswant Singh, *Jiannah India-Partition Independence*, PP. 123-124.

[৮] বিস্তারিত দেখুন, Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947*, PP. 64-73

[৯] সম্প্রদায়গত বোয়েদাদে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর আইন প্রণেতাগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে বিভক্ত করা হয়; মুসলমান, অনুন্নত সম্প্রদায় শিখ, ইউরোপীয় এবং হিন্দু সম্প্দ্রায়ের 'সাধারণ' জনগণসহ জমিদারদের বিশেষ নির্বাচনী এলাকা, শ্রমিক, মহিলা ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল এই বিশেষ সম্প্রদায় ও স্বার্থের সংগে সংশ্লিষ্ট। সংখ্যা নয়, প্রত্যেক গ্রুপের গুরুত্ব অনুযায়ী আসন বন্টন করা হয়। আইন সভার নির্বাচন ছিল 'পৃথক প্রতিনিধিত্ব মূলক'। মুসলমানরা নির্বাচিত করবে মুসলমানদের, হিন্দুরা নির্বাচিত করবে হিন্দুদের এবং ইউরোপীয়রা নির্বাচিত করবে ইউরোপীয়দের। জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল, হিন্দু সম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ, ১৯৩২-৪৭*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৪। মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত বণ্টন ছিল নিম্নরূপ;

প্রদেশ	মুসলিম জনসংখ্যার হার	মোট আসন	মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত আসন
মাদ্রাজ	৭.৯	২১৫	২৯
বোম্বে (সিন্ধু ছাড়া)	৯.২	১৭৫	৩০
বাংলা	৫৪.৭	২৫০	১১৯
যুক্তপ্রদেশ	১৫.৩	২২৮	৬৬
পাঞ্জাব	৫৭.০	১৭৫	৮৬
মধ্যপ্রদেশ	৪.৭	১১২	১৪

আসাম	৩৩.৭	১০৮	৩৪
সিন্ধু	৭০.৭	৬০	৩৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯১.৮	৫০	৩৬
বিহার এবং উড়িষ্যা	১০.৮	১৭৫	৪২

দেখুন, Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947*, P. 78

[১০] Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, The Muslim League and the demand for Pakistan*, Cambridge University Press, 1994, PP. 12-13.

[১১] Jaswant Singh, *Jiannah India-Partition Independence*, P. 120.

[১২] Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947*, P. 30

[১৩] Jaswant Singh, *Jiannah India-Partition Independence*, P. 208.

[১৪] Chowdhury Khalikuzzaman, *Pathway to Pakistan*, Lahore 1961, 134-38

[১৫] Rajani Palme Dutt, *India Today and Tomorrow*, Lawrence and wishart, London, 1955, P. 234.

[১৬] Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947* P. 176-177.

[১৭] সাংগঠনিকভাবে কেমন দুর্বল সেটা অনুধাবন করা যাবে ভারতে অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বেঙ্গল মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের বিবরণে- '... ৩ নং ওয়েলেসলীর বাড়িটিতে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের অফিস হয়। বাড়িটি দ্বিতল বিশিষ্ট ছিল। ... নীচের তলায় একটি কামরায় মুসলিম লিগের অফিস এবং উপর তলায় একটি কামরায় অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক তার পরিবার নিয়ে থাকেন। অবশিষ্ট ৮টি কামরা মুসলিম লিগের পার্লামেন্টারী পার্টির কয়েকজন সদস্য দখল করে বাস করছিলেন। এঁরা উপর তলার বড় কামরাটিকে খাবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। নীচের তলায় ... দুটি টেবিল. কয়েকটি চেয়ার, একটি টাইপ মেশিন এবং নথিপত্র ইত্যাদির জন্য একটি আলমারি রয়েছে। ... মুসলিম লিগের একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বটে কিন্তু কোষাগার ছিলো না, কেননা তহবিল বলতে মুসলিম লিগের কিছুই ছিল না। ... মাসের প্রথমে অফিস সেক্রেটারী ফরমুজুল হক সুরাওরাদীর দারস্থ হয়ে তাঁর নিজের খোরাকির টাকা, টেলিফোন, ইলেকট্রিক বিল, টাইপিস্ট ও কেরানীর বেতন এবং অন্যান্য খুচরা খরচের অর্থ প্রার্থনা করতেন। ... বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগ 'আহসান মনজিলের খাজাদের পকেটভুক্ত ছিল'। ঢাকা নওবাব পরিবারের ন'জন সদস্য ছিলেন বঙ্গীয়, 'প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য'। দেখুন, আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*। চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩-৪৫।

[18] Talukder Maniruzzaman, *The Politics of Development: The Case of Pakistan, 1947-1958,* Green book House, Dhaka, 1971, PP. 19-20.

[১৯] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত*, পৃ. ৩৫৫

[২০] ১৯৩৭ এর নির্বাচনে মুসলিম লিগ মুসলিম ভোটের কত শতাংশ পেয়েছিল সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়: ৪.৮% এর তথ্য পাওয়া যায় Abida Shakoor, *Congress Muslim League Tussle 1937-1940: A Critical Analysis*, P. 16. ৪.৬% এর তথ্য পাওয়া যায়- Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947*, P. 177. 8.8% পাওয়া যায়- Ayesha jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, The Muslim League and the demand for Pakistan*, P. 32.

[২১] Abida Shakoor, *Corgress –Muslim League Tussle 1937-40: A Critical Analyasis*, Aakar Books, Delli, 2003, P. 16

[২২] দেখুন Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, The Muslim League and the demand for Pakistan*, P. 32.

[২৩] Ayesha Jalal, *The sole spokes man Jinnah, The Muslim League and The Demand for Pakistan*, P.33

[২৪] Ibid., P. 33

[২৫] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, পৃ. ৩৮৫

[২৬] Jaswant, *Jinnah India-Partition Independence*, P. 210

[২৭] Ibid., P. 213

[২৮] Khalid bin Sayeed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* P. 88

[২৯] Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* P. 227

[৩০] Ibid., P. 90

[৩১] Ibid., P. 178

[৩২] Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence* P. 127

[৩৩] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত*, পৃ:৩৬২

[৩৪] Hector Bolitho, *Jinnah: Creator of Pakistan*, Oxford University Press, Karachi, 1966, P. 124

[৩৫] Khalid bin Sayeed *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* P.101-118

[৩৬] Jaswant, Singh, *Jinnah India-Partition Independence* P. 238

[৩৭] Khalid bin Sayeed *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* PP. 179-180

[৩৮] Ibid., P. 95

[৩৯] Talukder Maniruzzaman, *The Politics of Development: The Case of Pakistan, 1947-1958,* P. 21

[৪০] Ibid., 21

[৪১] Khalid bin Sayeed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* P. 200

[৪২] দেখুন, Ibid., 134-175

[৪৩] Ibid., 201-202

[৪৪] Ibid., 178

[৪৫] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত*, ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ.৩৫৯

[৪৬] দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

[৪৭] দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬১

[৪৮] Azad, Maulana Abul Kalam, *India wins Freedom*, Longman Green and Co, 1960, P. 188

[৪৯] Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* P. 228

[৫০] Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* 228-229

[৫১] Abida Shakoor, *Congress-Muslim League Tussle 1937-40) A critical Analysis*, P. 66

[৫২]. Hector Bolitho, *Jinnah: Creator of Pakistan*, P. 113-114

[৫৩] Jarwant Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* P. 232

[৫৪] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত*, পৃ. ৩৫৭

[৫৫] Khalid Bin Sayeed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* PP. 69-97

[৫৬] সুমিত, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ.* ৩৬২-৩৬৩

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৩

[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

[৬০] Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence*, P. 261

[৬১] Ibid., PP. 262-263

[৬২] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, পৃ. ৩৮৪

[৬৩] Jaswant, Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* P. 264

[৬৪] Ibid., P. 268

[৬৫] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, পৃ. ৩৮৫

[৬৬] Stanley wolpert, *Jinnah of Pakistan,* oxford University prass, Karachi, 2004,P.208

[৬৭] Ibid., P. 208

[৬৮] Ibid., P. 209

[৬৯] সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, পৃ. ৩৮৮*

[৭০] Khalid bid sayeed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* P. *181.*

[৭১] দেখুন, Jaswant Singh, *Jinnah India-Partition Independence,* PP. 301-303 আরও দেখুন, সুমিত সরকার *আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭*, পৃ. ৪১৬

[৭২] Jamil-Ud-din Ahmed ed., *Speeches and writing of Mr. Jinnah, Vol. I*, Ashraf, Lahore, P. 132.

[৭৩] Michael Breceher, *Jawarlal Nehru: A Political Biography,* Oxford University Press, London, 1959, P.353.

[৭৪] Khalid bin Sayed, *Pakistan: The Formative Phase 1857-1947,* P. 184

[৭৫] Ibid., P. 181

[৭৬] Ibid., P. 175

[৭৭] Ibid., P. 185

[৭৮] Stanley Wolpert, *Jinnah of Pakistan,* P.152

[৭৯] Ibid., P. 198

[৮০] Stanley wolpert, *Jinnah of Pakistan,* PP. 152-153

[৮১] Ibid., PP, 153-154

[৮২] Ibid., P. 155

[৮৩] Jamil uddin Ahmed, *Speeches and writing of Mr. Jinnah, Vol. I,* P. 199

[৮৪] Ibid., P. 240

[৮৫] Jaswant singh, Jinnah*; India-partition Independence*, P. 264

[৮৬] Ibid., P. 265

[৮৭] Ibid., P. 267

[৮৮] Khalid Bin Sayeed, Pakistan: *The Formative Phase 1857-1948,* P. 99

[৮৯] Jaswant singh, Jinnah*; India-partition Independence*, P, 305

[৯০] Khalid Bin Sayeed, Pakistan: *The Formative Phase 1857-1948,* P. 99